ইউলিয়া ড্রুনিনা

আলিসা আমার আলিসা

ইউলিয়া দ্রুনিনা

আলিসা আমার আলিসা

ছবি:
ভেনিয়ামিন লসাত্তিংসিন

অনুবাদ:
দেবী শর্মা

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

এস্তোনিয়ার ঘটনা। ১৯৪৪ সালের শরতের শেষ। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রাণপণে লড়ছে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে।

গোলন্দাজ বাহিনীর আগুয়ান একটি দলের আমি ফিল্ড নার্স। আমাদের অ্যাম্বুলেন্সটি পেছনে কোথাও আটকে গিয়েছিল। গাড়িটির সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। এদিকে ব্যাণ্ডেজ ফুরিয়ে আসছিল। এগিয়ে হামলা চালালে সব সময়ই আহতের সংখ্যা বাড়ে।

একটি গ্রামের খামারবাড়িতে সবেমাত্র আমরা থেমেছি। এক বুড়ি এল আমার কাছে। তার দুর্বল, রোগা হাতে সযত্নে ধরে রাখা একটি মুরগী তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল। এস্তোনিয়ার ওই বুড়ি এতটুকু রুশভাষা জানত না, কিন্তু সেজন্য তার বক্তব্য বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না: মুরগীটার একটা ভাঙ্গা পা শিরার সঙ্গে কোনক্রমে ঝুলে আছে — হয়ত গোলাগুলির জন্যেই। ওকে বাঁচানোর জন্যে বৃদ্ধার নীরব কাকুতি-মিনতি আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হয় নি। যারা মনে করে দুঃখকষ্ট কেবল মানুষেরই ব্যাপার আমি তাদের দলে নই।

কিন্তু সঙ্গীরা কী বলবে?

ব্যাণ্ডেজের দারুণ ঘাটতির কথাটা আমি বুড়িকে বোঝাতে চাইলাম। কিন্তু বৃথা। সে কেবলই নীরবে মুরগীটা আমার হাতে তুলে দিচ্ছিল। চারপাশে কৌতূহলী ফৌজী লোকদের ভিড় জমে গেল। হঠাৎ মাঝবয়সী এক সেপাই খেঁকিয়ে উঠল:

‘তরতাজা একটা জীব কী কষ্টটাই না পাচ্ছে! তোমার কি দয়ামায়া নাই গো?’

এক তরুণ সায় দিল:

‘এই শহুরেগুলো সবাই সমান। দয়ামায়ার বালাই নেই।’

তারপর গঞ্জনার ঝড় উঠল। প্রসঙ্গ: আমার নিষ্ঠুরতা। বলতে কিছুই বাদ দেয় নি তারা। ওসব আর মনে করতে চাই না... ভাবলে আজও বড় অস্বস্তি লাগে।

একজন অবশ্য ঠাট্টা করেই বলেছিল যে ‘জখমী’ মুরগীটি দিয়ে

চমৎকার ঝোল বানানোই ভালো। কিন্তু সবাই তাকে এমন ঠেসে ধরেছিল সে বেচারী মুহূর্তে চুপসে গিয়ে কেবল পিট্‌পিটে চোখে তাকিয়ে ছিল।

আমি ব্যাগ খুললাম। কেউ একজন আমার জন্য দু'টুকরো কাঠ পালিশ করে আনল। পুরো ডাক্তারীবিদ্যা খাটিয়েই ওগুলি দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলাম।

এভাবেই খোদ ফ্রণ্টের সিপাইদের কাছ থেকে দয়ামায়ার একটা সুশিক্ষা পেয়েছিলাম। অথচ যুদ্ধের দৌলতে তাদের মন থেকে তো এসব 'ভাবালুতা' বেমালুম সাফ হওয়ারই কথা।

শিক্ষাটি কোনদিন ভুলি নি। আলিসা সম্পর্কে এই লেখাটি নিয়ে বসার সময়ও তা মনে পড়েছে। ওকে নিয়ে লেখার কি কোন মানে হয়? চোখে ভেসে উঠেছে বহু দূরের সেই শরৎকালের যুদ্ধ আর নিজের চেহারাটি — জবুথবু একটি মেয়ে, কাঁধে রেডক্রসের ব্যাগ, হাতে একটি কোঁকান মুরগী।

একদিন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী আমার মেয়েটি একটি কুকুরের কথা বলল। কুকুরটি নাকি 'নিজেকে বিক্রি করতে চায়'।

আলিওনার সঙ্গে ওই কুকুরটির মোলাকাত মস্কোর চিড়িয়া-বাজারে। রোজ রবিবার ওখানটায় ওর হাজির হওয়া চাই। বাজারটি কেবল পাখির নয়। ওখানে বিকিকিনি হয় হরেকরকম পোষা জীব — বেড়াল, গিনিপিগ, কুকুর...

পাথরের দেয়ালের পাশ বরাবর কুকুর-বেচিয়েদের সারি। অচেনা

পরিবেশ আর মালিকের বেইমানিতে বিরক্ত কুকুরগুলো পথ-চলা সকলের দিকেই আক্রোশে দাঁত খিঁচোচ্ছিল। তাছাড়া যাতে রাগী দেখায় সেজন্য মালিকরাই ওগুলোকে খেপিয়ে তুলছিল যেমনটি শুনেছি, জিপসীরা তেজী দেখানোর জন্য ঘোড়াগুলোকে ওসকাত। লোকে কুকুর কেনে তো বাড়িঘর পাহারা দেয়ার জন্যই। তাই কুকুর যত বদমেজাজী দামও ততই বেশি।

হাড্ডিসার বেওয়ারিশ একটি নিঃসঙ্গ অ্যালসেশিয়ান চুপচাপ বসেছিল দেয়ালের পাশে। বিকান কুকুরের নতুন মালিকদের দিকে সে তাকাচ্ছিল রীতিমতো ঈর্ষায়। দুঃখী চোখ, লাজুকভাবে নাড়ান লেজ, সব মিলিয়ে তার করুণ ভঙ্গিটি যেন বলছিল, নাকি চিৎকার করছিল, 'আমাকেও নাও, নাও-না ভাই।'

কিন্তু দাম নেই যার, খদ্দেরও নেই তার। যে-কুকুর নিজেকে বেচতে চায়, নিজেকে তুলে দিতে চায়, তার ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত, সন্দেহজনকও বটে। দেখতে অ্যালসেশিয়ান হলেও ওর কুলপঞ্জীর হদিশ কে জানে!

গত তিন রবিবার থেকে আলিওনা কুকুরটিকে বাজারে ঠিক একই জায়গায় ওই পাথরের দেয়াল ঘেঁসে বসতে থাকতে দেখছে। প্রত্যেক বারই তার চোখগুলো আরো দুঃখী, শরীর আরও চিমসে, রোগা-পটকা মনে হয়েছে।

কাহিনীটি শোনার পর কুলপঞ্জীর হদিশ ছাড়াই, এমন কি দোআঁশলা হলেও আমরা ওকে পোষ্য নেওয়া স্থির করে ফেলি।
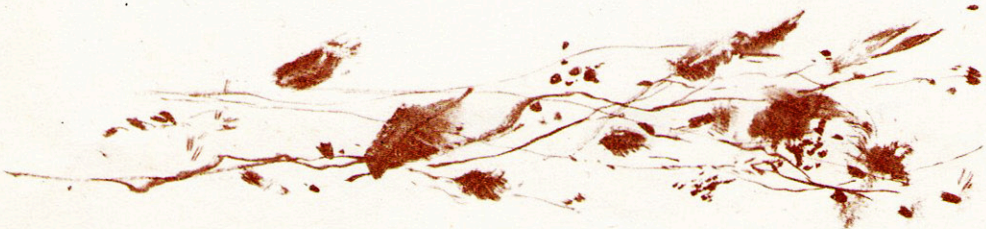
পরের রবিবার তড়িঘড়ি বাজারে হাজির হলাম। মানুষ আর জীবজন্তুর ভিড়ের মধ্যে ঠেলে ঠেলে পথ চলতে লাগলাম। মানুষের হল্লা, কুকুরের চিৎকার, পাখির কাকলির উদ্দাম শব্দস্রোত। আমি দিশেহারা।

শেকল-হেঁচড়ান ঘোঁৎঘোঁতে কুকুরগুলির মাঝখানে হঠাৎ বরফের ওপর গুটিসুটি বসে থাকা একটি অদ্ভুত জন্তু চোখে পড়ল — সন্ত্রস্ত, হতবুদ্ধি। বিড়ালের মতো ছোটখাটো হালকা-ধূসর লোম, ড্যাবডেবে উজ্জ্বল-হলুদ চোখ, আঁটোসাঁটো শরীর, মোটা ফুলানো লেজ, পলকা পা, ইংরেজী এক্স অক্ষরের মতো পেছনের সরু পাদুটি বাঁকান।

জন্তুটির ঘাড়ে ঘরে-তৈরি একটি পট্টি ছিল, আর তাতে লাগান শেকলটি ধরে দাঁড়িয়েছিল কাঁচুমাচু-মুখ পুঁচকে একটি ছেলে। মনে হল রবাহূত পোষ্যটিকে দূর করার কড়া হুকুম দিয়ে ওকে বাড়ি থেকে তাড়ান হয়েছে।

আমি উবু হয়ে ওর গায়ে আলতোভাবে হাত বুলাতে লাগলাম। সে কানদুটি নোয়াল।

'হুঁশিয়ার, কামড়াবে,' ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু ইতিমধ্যেই ওকে আমি কোলে তুলে নিয়েছি। বুকে ওর তুমুল ধড়ফড়ানি, গোটা শরীরটা খিঁচুনিতে কাঁপছিল। বেচারী! একটি বুনো জন্তুর জন্য কী ভয়ংকর জায়গা!

আসলে ওকে আমি কোন বুনো-জন্তু ভাবি নি — বড় করুণ, বড় ভীতু মনে হয়েছিল তাকে। তাছাড়া ওকে পশুর ছা ভেবেছিলাম। পরে

শুনে অবাক হয়েছি যে কমবয়সী হলেও ওটা সাবালক স্তেপ-শিয়াল, কর্সাক।

বিশ্বকোষে এদের সম্পর্কে লেখা আছে: 'কর্সাক দেখতে সাধারণ শেয়ালের মতোই, তবে আকারে ছোটোখাটো (শরীরের দৈর্ঘ্য ৫০-৬০ সেণ্টিমিটার, লেজ ২৫-৩৫ সেণ্টিমিটার), এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের মরু বা মরুপ্রায় এলাকার বাসিন্দা। সোভিয়েত ইউনিয়নে উত্তর ককেশাস থেকে ট্রান্সবৈকাল ও প্রত্যন্ত উত্তরের ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত এলাকায় দেখা যায়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের শত্রু কর্সাক মানুষের উপকারী জন্তু।

'উপকারের প্রতিদানে' মানুষ কর্সাকদের বেপরোয়া নির্মূল করে চলেছে। কেননা, দুঃখের বিষয়, বিশ্বকোষের বর্ণনায় ওগুলির 'চামড়া মহার্ঘ''।

...কর্সাকটিকে বুকে চেপে ধরলাম আর মলিনমুখ খুদে ব্যাপারীটি পকেটে গুঁজল দশ রুব্‌লের নোট (তেমন কিছু চড়া দাম নয়)।

এজন্য আমাকে যে অঢেল ঝামেলা পোহাতে হবে জানতাম। একটি বুনো জন্তুকে তার জগৎ থেকে আমাদের দুনিয়ায় আনলে, তাকে জেলখানায়, অর্থাৎ খাঁচায় আটকে রাখতে না চাইলে সত্যি সত্যি যেসব অনিবার্য প্রস্তুতির অসুবিধা দেখা দেয় ও বেড়ে ওঠে আমি কেবল সেগুলির কথা বলছি না। কিংবা 'যাদের পোষ মানিয়েছ, বন্ধুত্ব পাতিয়েছ তাদের জন্য তুমি দায়ী বৈকি...' দিনরাত এই যে কর্তব্যের খোঁচা তোমাকে অস্বস্তি দেয়, কেবল তাও নয়।

বুনো জন্তুদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটি যে শেষাবধি প্রায় সর্বদাই বিয়োগান্ত হয় সেটাই দুঃখের কথা। অরণ্যজগতের নিয়ম ভাঙলে সে তার পুরো খেসারত আদায় করে নেয়।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম: শেয়ালটিকে সে কী নামে ডাকে, কোথায় পেয়েছে, কী খায়। আমার তো নিত্যদিন ইঁদুর যোগানোর সাধ্য হবে না। আর ঠিক তখনই আলিওনা ঘূর্ণিবাত্যার মতো আমার উপর চড়াও হল, সঙ্গে ওই কুকুরটি, যেজন্য আমাদের বাজারে আসা। দেখলাম সত্যিই এক অ্যালসেশিয়ান। জড়সড়, শান্ত আর কেমন যেন করুণ চেহারার। শেষ পর্যন্ত একজন খদ্দের জুটে যাওয়ায় যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে এই আনন্দে সে মেয়ের পিছু পিছু চলল একেবারে আঠার মতো সেঁটে। ওখানেই নামকরণ পর্ব শেষ — কুকুরটির নাম হল শান্ত আর শেয়াল হল আলিসা।

ইতিমধ্যেই আলিসার প্রাক্তন মালিকটি উধাও। তাই এই বিস্তীর্ণ উত্তুরে এলাকায় আলিসার আসার কাহিনীটি আর জানা গেল না। ছেলেবেলার প্রায় ভুলে যাওয়া রূপকথার রেশ থেকে মনে করা: এসেছে তেপান্তর পেরিয়ে সরু সরু, লম্বা লম্বা পা চালিয়ে।

আলিসাকে বুকে চেপে চারিদিকে সবার নজর কেড়ে ভিড় ঠেলে এগুচ্ছিলাম। বেচারী বেজায় কাঁপছিল। একটি চতুর নাছোড়বান্দা ছোট্ট মেয়ে আমার পিছু নিয়েছিল। তার একটানা বিরক্তিকর প্রশ্ন, 'এই যে মাসিমা, ও মাসিমা, কিনলেন কেন ওটা? লোমের কলার বানাবেন?'

আলমারির নিচে বাঁকা বাঁকা ভয়ংকর নখের থাবার মুরগীর একটা

হলদে ঠ্যাং নিয়ে উল্টেপাল্টে ছুটোছুটি করছিল আলিসা। ওর রুচি সম্পর্কে তখনো কিছু না জানলেও সে যে নিরামিষাশী নয় তাতে সন্দেহ ছিল না।

তখনই হাড় ভাঙ্গার শব্দ শোনা গেল। আমার মেয়ে আলমারির নিচে উঁকি মারল আর হাড় ভাঙ্গার বদলে শুনলাম কাশির আওয়াজ। আলিসার গলায় হাড় বিঁধেছে ভেবে আমরা ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু অচিরেই জানা গেল এই কাশির আওয়াজটা আসলে কর্সাকদের মেজাজ দেখানোর, মাঝারি ধরনের রাগের একটা ধরন।

পুসি ঘরে এলে আলিসা আরেক ধরনের মেজাজ দেখাল। বিড়ালটি স্বভাবতই তখন অস্থির আর বিব্রত, বুনো জন্তুর গন্ধে উত্তেজিত। আলিসা আলমারির তলা থেকে ছুটে বেরুল, কুকুরছানার মতো চড়া গলায় অবিরাম চেঁচাল। বুঝলাম এটা তার চরম রাগের অবস্থা।

পিঠ উটের মতো কুঁজো করে পুসি জবাব দিল। আমি তড়িঘড়ি তাকে তুলে যখন ঘরের বাইরে নিয়ে গেলাম, তখনো সে থুথু ছিটাল, রাগে গর্‌গর্‌ করল।

শান্তকে যথারীতি পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে আলিসা তাকেও এইভাবে আপ্যায়ন করল। বাজার থেকে ফেরার পথে দু'জনেই এতটা বেহাল ছিল যে কেউ কারও দিকে তাকায় নি। কিন্তু বাড়ি এসে চলাফেরার পুরো স্বাধীনতা পেয়ে নিজের এলাকাটিতে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে আলিসা নিজের মৌরসী স্বত্বটি কায়েম করে বসেছিল। নিরীহ শান্ত ওই পাগলাটে দাঁতখিঁচান, বেআদব খুদে জন্তুটির দিকে অবাক হয়ে
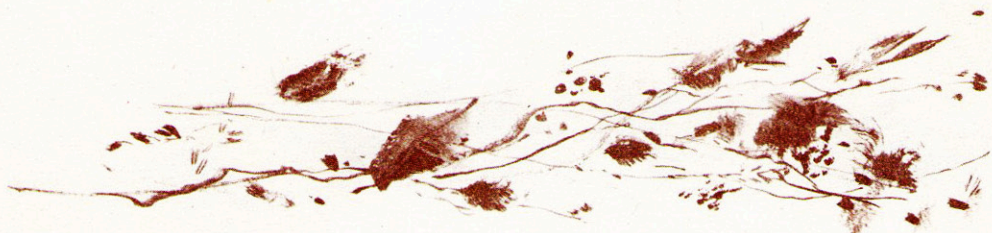
তাকিয়ে রইল। ওকে ছুড়ে ফেলার জন্য তার একটি থাবাই তো যথেষ্ট। তাই পরিচয়ের আয়োজনটি ভেস্তে গেল। কুকুরটিকে সরিয়ে নিলাম।

পুসি ও শান্তকে এতটুকু আশকারা না দিয়ে সে সবগুলি আসবাব, চেয়ার, টেবিলের পা শুঁকতে লাগল। শেষে লাফিয়ে উঠল জানালার কাছের আরামকেদারায়, তারপর সামনের দু'পায়ে জানলার তাকে ভর দিয়ে বাইরে মস্কোর তুষার-ঢাকা চত্বরের দিকে দারুণ কৌতূহলে তাকিয়ে রইল। অতঃপর প্রতিদিন ক্রমাগত অজস্রবার এই কসরৎ। জানালার ওপারেই অবাধ মুক্তি।

চীনামাটির ছোট্ট অথচ গভীর একটা ছাইদানিতে মাংসের কিছুটা ঝোল ঢেলে আলিসাকে ডাকলাম। সে শুঁকে দেখল, গুটিসুটি মেরে বসল এবং পরমুহূর্তে নিপুণ লক্ষ্যভেদীর ক্ষিপ্রতায় পাত্রটি উল্টে ফেলে খুব খোলাখুলিই তার প্রচন্ড অনিচ্ছা জানাল। আমরা হতভম্ব। খেতে বসে এ কী ধরনের আচরণ!

পরে বুঝতে পারলাম যে ওরা সবসময় নিজেদের মনমতো গোপন জায়গায় খাবার জমিয়ে রাখে। কিন্তু তারা সাধারণত মাটিতেই তা পুঁতে রাখতে চায়। এখানে তো মাটি নেই। তবু আলিসা দিব্যি চালিয়ে নিল। সহজাত অভ্যাস।

আমার কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল এ ব্যাপারে আলিসার অদ্ভুত রসবোধ আছে। খুদে শয়তানটি খাবার অপছন্দ হলেই সব সময় পাত্রটি উল্টে ফেলত।

রাত এলেই আলিসা দারুণ চাঙ্গা হয়ে উঠল। কাঠবিড়ালীর মতো সে সারা ঘরে ছুটাছুটি করতে করতে, চেয়ারে লাফিয়ে উঠতে নামতে লাগল। শেয়ালরা নিশাচর। কিন্তু আমরা তো আর ওই জাতীয় জীব নই। রাতে আমাদের ঘুমানো দরকার। তাই ঠিক করলাম ওকে বাথরুমে আটকে রাখব। কিন্তু কথার চেয়ে কাজটি অনেক কঠিন ছিল।

সারাটা দিন খাবার ঘরে যাতায়াতের সময় আমরা তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করেছি, পাছে ধড়িবাজ শেয়ালটি হলঘর পেরিয়ে অন্যসব ঘরেও ছুটোছুটি শুরু করে। খাবার ঘরেই কেবল চিড়িয়াখানার ওই বোটকা গন্ধটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু আলিসা জেদ ধরল পুরো ফ্ল্যাট্‌টাই তার দখলে চাই। শেয়ালী ধূর্তামী, একগুঁয়েপনা, ফন্দিফিকির খাটাতে একটুকু কসুর করল না।

কিন্তু হলঘরের দরজা খোলা দেখা মাত্র, তাকে ওখান থেকে এক-পা নড়ান গেল না। সুতোয় মাংসের টুকরো ঝুলিয়ে বিড়ালছানার মতো আলিসার সঙ্গে খেলতে খেলতে তাকে হলঘরে ভুলিয়ে আনার চেষ্টা করলাম। সে ছুটতে ছুটতে হলঘরে এল। কিন্তু কেউ খাবার ঘর বন্ধের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করতেই তাকে দিব্যি হারিয়ে দিল, আবার নাগালের বাইরে চলে গেল। খুশিমাখা, তুষ্ট তার তেরছা 'ঢঙ্গী' চোখদুটি দুষ্টুমিতে জ্বলজ্বল করছিল। সে ভেঙচিতে মুখ অনেকটা হাঁ করে স্পষ্টতই আমাদের ঠাট্টা করল।

এভাবে রাত দুটো পর্যন্ত আমাদের 'তামাশা' চলল। সমবেত কারিগরির ফল হিসাবে তৈরি হল এক জটিল সরঞ্জাম, যাতে ছিল

একটি দড়ি, তার একদিক আলিওনার হাতে, অন্যটি দরজার হাতলে বাঁধা। কিন্তু তাতেও তেমন কিছু হল না। আলিওনা টান দিয়ে দরজা বন্ধ করার আগেই আলিসা ঢুকে যেতে লাগল।

কিন্তু শেষাবধি ফাঁদে কাজ হল। আলিসা হয়ত ক্লান্ত হয়ে এই খেলায় হাল ছেড়ে দিয়েছিল। যা হোক ক'রে বাথরুমেই তাকে সেঁধান গেল।

এতে এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে ঘুম না আসায় ঘুমের বড়ি খেতে হল। কেবল ঝিমুনি এসেছিল আর তখনই শুনলাম কানফাটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ।

লাফিয়ে উঠে ছুটলাম বাথরুমে। দেখলাম এক অভাবনীয় তুলকালাম কাণ্ড। পেছনের দু'পায়ে ওয়াশবেসিনে দাঁড়িয়ে আলিসা সামনের থাবা দিয়ে পরিপাটিভাবে কাঁচের তাকের সব কিছু একটা একটা করে নিচে ফেলছে: টুথব্রাস রাখার গ্লাস, দাঁতের মাজনের বাক্স, সাবান, শ্যাম্পু, ওডিকলোন, ক্রিমের কৌটো। বেসিনে, মেঝেতে ওগুলি পড়ছিল — ভেঙে খানখান, থেঁতলান, ছত্রাখান।

একটুকু না-ঘাবড়েই শেয়ালটি দিব্যি ধীরেসুস্থে আমার দিকে মুখ ফেরাল — নাক-মুখ দাঁতের মাজনে সাদা। হাঁ-মুখে সেই চেনা ভেঙচি।

জঞ্জালগুলো সরালাম। আলিসার নাগালের মধ্যেকার সম্ভাব্য সব কিছু বাথরুম থেকে সরিয়ে হলঘরে আনলাম। আরও দুটি ঘুমের বড়ি গিলে শান্তিতে ঘুমুতে গেলাম। ভাবলাম এখন ত আর ওর কোন অস্ত্র নেই যা দিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গাতে পারে।

হায়রে দুরাশা! আমার সুখ আর নিদ্রা কোনটাই টিকল না। শেয়ালের বুদ্ধিসুদ্ধির হিসাবে ভুল করেছিলাম।

এক অদ্ভুত আঁচড়ানোর আওয়াজে ঘুম ভাঙল। শেয়ালের মুণ্ডপাত করে উঠে বসলাম। বাথরুমে গিয়ে দেখলাম সে বাথটবে হড়কাচ্ছে, যেমনটি শিশুরা শ্লেজ নিয়ে বরফের ঢিপি থেকে নামে। এই অদ্ভুত 'শিশুটি' তার থাবাগুলো (সম্ভবত নেমে আসার বেগ কমানোর জন্য) কাজে লাগিয়েছিল আর সেই আঁচড়ানোর আওয়াজেই আমার ঘুম ভেঙেছে।

বুঝলাম ওর 'রাত' না হওয়া অবধি সেই সকাল পর্যন্ত খেলাটি চলবে।

দু'দিন যেতেই আলিসা মনে হল অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নিজের গালিচাটি হেলায় ঠেলে (গরম!) বেচারী ঠাণ্ডা টালিতে একপাশে শুয়ে আস্তে গোঙাতে লাগল। শ্বাসে জ্বরের আঁচ, নাক শুকনো, গরম।

তাকে পশুডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম, সকলের দৃষ্টি পড়ল ওর ওপর। এমন কি ধবধবে সাদা রঙের চোখজুড়ান ডালকুত্তাটিও মুহূর্তে অপাংক্তেয় হয়ে গেল।

কিন্তু নিজের এতটা সমাদরও আলিসার মন কাড়ল না। অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল। আমাদের আর লাইনে দাঁড়াতে হল না। কিছুক্ষণ আগে এক বুড়িকে আমরা কাঁদতে দেখেছিলাম — তার নেশাখোর বেড়ালটা ভালেরিয়ানের আরক খেতে গিয়ে শিশির মুখের রবারের ছিপি গলায় আটকে যায়-যায় অবস্থা হয়েছিল। এরই মধ্যে
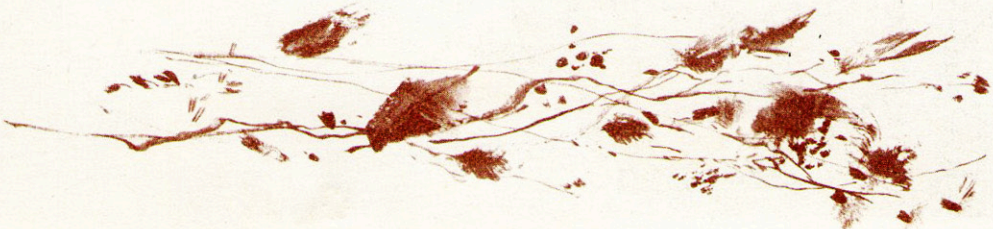
দেখি বুড়ি খুশমেজাজে তার সদ্য সেরে ওঠা বেড়ালটা নিয়ে বেরুচ্ছে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে আলিসাকে নিয়ে রোগী-দেখার ঘরে ঢুকলাম।

প্রথমেই তারা কাঁপুনি-ধরা শিশু-রোগীর লেজের তলায় একটি থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দিল। তাপমাত্রা ৪৪·৫° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। জন্তুদের জন্যও খুব বেশি, যদিও ওদের তাপমাত্রা মানুষের ওপরেই থাকে। ডাক্তার আলিসাকে ঠুকে ঠুকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে শেষে বললেন, 'নিমুনিয়া'।

আলিসার নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগেছিল বাজারে। বরফের ওপর অনেকক্ষণ একঠাই বসে বসে, উত্তেজনায় হাঁ-মুখ করে অঢেল তুষারহিম বাতাস গিলেছিল সে।

'খুবই অসুস্থ ও,' পশুডাক্তার বললেন। পেনিসিলিন ইনজেকশন দরকার। কিন্তু ইনজেকশন দিলে বুনো জন্তুর শক্ লাগতে পারে। প্রথমে বড়ি দিয়ে দেখা যাক। নাম কি?'

'আলিসা।'

'পদবি?'

'পদবি?' ঘাবড়ে গিয়ে পুনরাবৃত্তি করি।

'আপনার পদবি কী?' অধৈর্য ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

আমার পদবি বললাম। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লিখলেন। পথে একটি ওষুধের দোকানে থামলাম। ব্যবস্থাপত্রটা খুলে দেখি রোগীর নামধাম-পদবির জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় কালো অক্ষরে লেখা: 'শেয়াল আলিসা দ্রুনিনা'।

তারপর আলিসা দুনিনাকে সারিয়ে তোলার জন্য তেতো বড়ি গেলানোর সমস্যা দেখা দিল। দিনে তিনবার একটি শেয়ালকে ঠকান চাট্টিখানি কথা নয়।

প্রথমে কাঁচা লিভারের একটি টুকরো চিরে তাতে বড়িটা ঠেসে ঢুকালাম। প্রথম বার আমার চালাকিতে কাজ হল। রোগী খাবার আর ওষুধ দুটোই খেল। কিন্তু গেলার পর তাকে বিব্রত, বিরক্ত দেখাল: 'ভেতরে কী আজেবাজে জিনিস ঢুকিয়ে খাওয়ালে?'

দ্বিতীয় বার আলিসা লিভার খেল, বড়ি বাদ পড়ল। তৃতীয় বার খাবার থেকে সরাসরি মুখ ফিরিয়ে নিল।

আবার সে নিঃশব্দে একপাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। এককালের ফোলানো লেজটা এখন পেছনের দু'পায়ের মাঝখানে। আস্তে আস্তে গোঙাচ্ছে, শান্ত শিশুটি যেন।

পৃথিবীর কোন শক্তি যে আলিসাকে আর বড়ি খাওয়াতে পারবে না তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ওষুধ ছাড়া তো ওর বাঁচারও উপায় নেই। তাই আবার পশুডাক্তারের কাছে এলাম।

'দেখুন, আর তো উপায় নেই,' তিনি বললেন, 'ইনজেকশনের ঝুঁকিই নেওয়া যাক।'

নার্স আলিসার পা টেনে ধরল। ডাক্তার মোটা ছুঁচের একটা সিরিঞ্জ নিলেন। খারাপ একটা কিছু হওয়ার আশঙ্কায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু কী স্বস্তি! সবই ভালোয় ভালোয় উৎরাল।

আলিসা ক্রমেই সেরে উঠছিল। কিন্তু রোজ তিন-তিনটে ইনজেক্শন

দিতে দিনে তিন বার ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আমার স্বামী, জীবনে যে কোনদিন সিরিঞ্জ ধরে নি, সে দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিল: আলিসাকে নিজেই ইনজেক্‌শন দেবে।

আলিসা সতর্ক হয়ে আছে, একটা সন্দেহ ঢুকেছে তার মনে। তাকে কোলে নিয়ে আমি বসলাম। আমার স্বামী সিরিঞ্জে ওষুধ ভরল। ওর পেছনের এক্স ধরনের পা আস্তে করে টেনে ধরল, আয়োডিন ঘসল, শক্ত হাতে ছুঁচ ঢুকিয়ে দিল। আলিসা কেঁপে উঠল, পেছন থেকে কোন্‌ কুচক্রী 'কামড়েছে' তাকে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কেন জানি ওষুধ ভেতরে গেল না। প্রথম নিষ্ফলতার পর আনাড়ি বদ্যি চোখমুখ কুঁচকে সিরিঞ্জ তুলে নিল। আবার সে পা ঠিকঠাক করল, আর তখনই দেখলাম ডান হাতটি একেবারে আলিসার মুখে। আমার এই আবিষ্কারের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আবার ছুঁচ ঢোকাল আমার স্বামী। আমি চোখ বুজলাম। আলিসা একবার লোহার শেকলটা দাঁত দিয়ে অনায়াসে কেটে ফেলেছিল। যারা তাকে অকারণে জ্বালাতন করছে তাদের সঙ্গেই বা সে ভদ্রতা করবে কেন? সত্যিই তো একটা বুনো শেয়ালছানা কী করে বুঝতে পারবে যে ওর ভালোর জন্যই আমরা ওকে কষ্ট দিচ্ছি?

কিন্তু সে বুঝত। যেন সাধারণ বোধের বাইরে অন্য বোধ তাকে ঠিক তাই বলেছিল। কিংবা হয়ত আমার ওপর অটল বিশ্বাস ছিল। আলেক্সেই ছুঁচ ফোটানোর সময় শুধু সে কিছুটা দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল।

এবার সে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগল। ভালো হয়ে ওঠার

অনেকগুলো স্পষ্ট লক্ষণের মধ্যে সবচেয়ে বড় লক্ষণ ছিল — আবার সেই বেদম দুরন্তপনা। তার প্রথম দুরন্তপনায়ই আমরা পুরোপুরি আশ্বস্ত হলাম।

অল্পদিনের মধ্যেই আলিসা পুরোপুরি বদলে গেল। বাজারের হতভাগ্য, বাতিল-করা, ঠাণ্ডায় কাঁপুনি-ধরা রোগাপটকা প্রাণীটি আমাদের সংসারের আদর্শ হয়ে উঠল, আমাদের ছোট্ট পরিবারের সকলের মন কাড়ল।

আলিসার মন পাওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমিই হলাম তার মনের মানুষ আর সেজন্য আমার দেমাকও কিছু কম ছিল না।

কেবল আমিই তাকে কোলে নিতে পারতাম। কিন্তু তাতেও প্রথম কিছুক্ষণ সে কাঁপত, কান নোয়াত, মানুষের প্রতি অনুরাগের সঙ্গে বুনো জন্তুর সহজ প্রবৃত্তির লড়াই চলত।

আলিসা একমাত্র আমার হাত থেকে সরাসরি খাবার খেত। একটু একটু কামড়ে কামড়ে অদ্ভুত নৈপুন্যে সে খাবারটুকু সাবাড় করত। আঙুল নিয়ে আমার কখনই কোন ভয় ছিল না।

একদিন আমার স্বামী আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ওকে হাত দিয়ে খাওয়াবে ঠিক করল। সে তাকে এক টুকরো লিভার দিল। আলিসা খুশিমনেই সেটা নিল, কায়দা করে মেঝের উপর রাখল এবং তারপরই হঠাৎ এক লাফ দিল। 'অন্নদাতার' আঙুল কামড়ানোর ঠিক চেষ্টা না বলে প্রতীক বলাই ভালো — খুবই স্পষ্ট করে সে বুঝিয়ে দিল —

ঘুস দিয়ে আমাকে ফুসলানোর চেষ্টা করো না, তেমন পাত্র আমাকে পাও নি! শেষে লিভারের টুকরোটা ধীরেসুস্থে খেতে শুরু করল ভারিক্কী মেজাজেই।

আমার মেয়েটিকে আলিসা রীতিমতো খেদিয়ে বেড়াতে লাগল। আলিসার ভয়ে সে কাঁটা হয়ে থাকত। সে তার পায়ে দাঁত বসানোর তালে থাকত। আলিওনা ঝাড়ু হাতে বাগিয়ে ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে অদ্ভুত ঢঙে ঘরে ঘুরে বেড়াত, প্রায়ই পরিত্রাহি চিৎকার শোনা যেত, 'মা, শিগগির এসো!'

আলিওনা এমন কী করেছে যার জন্য আলিসা তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না? কে জানে? কোত্থেকে কে জানে এখানে এসে-পড়া স্তেপের এই শেয়ালটার জীবনের আগের কথা আমাদের কিছুই যে জানা নেই! হয়ত কোন হিংসুটে মেয়ে কখনো তাকে জ্বালাতন করে থাকবে আর আলিওনা তারই মতো দেখতে — ঢেঙা, মাথার চুল উসকো-খুসকো, উঁচু কণ্ঠস্বর, তড়বড়ে চলাফেরা।

কিংবা হতে পারে আলিওনার ঝাঁকি মেরে চলা বা চেঁচিয়ে কথা বলাটা আলিসার পছন্দসই নয়। কে জানে?

আমি নিজে কিন্তু খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলতে বলতে শিখলাম। বন্ধুরা তামাসা করে বলতে লাগল যে আলিসা আসার পর আমি নাকি হাঁটি না, ভেসে চলি, আড়মোড়া ভাঙ্গি না কেবল হাত নাড়ি, কথা বলি না, ফিস্‌ফিস্‌ করি।

বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে — পোষা কিছু না রেখে এই বুনো জন্তুটা

কেন রেখেছি। ওটার জন্য তো আসলে আমার ঝঞ্ঝাটের একশেষ।

উত্তরে শুধু কাঁধ ঝাঁকাই। কেন? কারণ ওটি আমার জীবন আনন্দে ভরে দিয়েছে। আমার ভালোবাসা একটি অবাধ্য খুঁতখুঁতে জন্তুকে জয় করেছে বলে আমি আমাদের মধ্যে এতটা সমঝোতা ও বিশ্বাসের নতুন বন্ধন দেখে খুশি হয়ে ওঠি।

আমার দারুণ ভালো লাগে, যখন শুনি যে ঘরে ফেরার সময় লিফ্‌টের দরজা খোলার আওয়াজেই আলিসা কান খাড়া করে ঝিঁঝি পোকার মতো চিঁচিঁ শব্দ করে কুকুরের মতো দরজায় ছুটে আসে। কিন্তু ঘরে ঢুকলে এমন ভাব দেখায় যেন নিজের কাজেই সে হলঘরে এসেছিল, আমাকে তোয়াজ করতে নয়। দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না। এখানেই কুকুরের সঙ্গে তার তফাত।

আর এই স্বভাবগুলিই আমার ভালো লাগত সবচেয়ে বেশি: অহংকার, সংযম ও স্বাধিকার। এতে অনুরাগের প্রতিটি ইঙ্গিত আরও লোভনীয় হয়ে উঠত।

অবসন্ন, নিজের ওপর বিরক্ত, আমার মানুষ-জীবনের অজস্র দুশ্চিন্তার ভারে হতাশ আমি কোন বিকেলে যখন সোফায় কুঁজো হয়ে বসতাম তখন হঠাৎ এই খুদে বুনো জীবটি লাফিয়ে উঠে কোলে গুটিসুটি মেরে মুখ গুঁজত — আমার আনন্দের অবধি থাকত না।

আর দুষ্টুমি? মায়েরা এজন্য, এমন কি কখনো দিশেহারা হলেও, সন্তানের প্রতি তাদের ভালোবাসার কোন ঘাটতি ঘটে?

সব মিলিয়ে আলিসার স্বভাব ছিল বাঁদুরে। অনাসৃষ্টি ঘটানোর
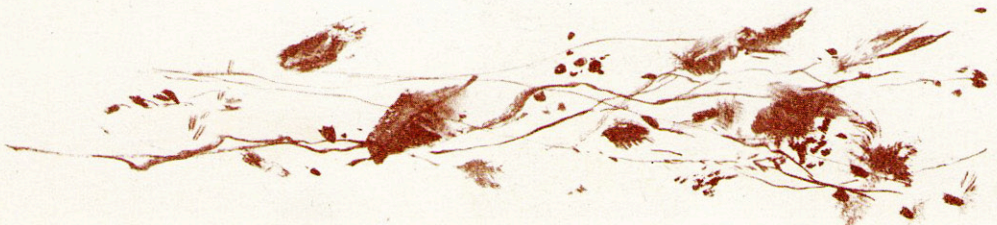
আবেগটা সে ধরে রাখতে পারত না — জিনিসপত্র ছিঁড়ত, ভাঙত, চিবোত। সেজন্যেই আমরা কেউ বাড়িতে না-থাকলে আর রাতের বেলা শুধু 'আপন ভুবন' হলঘরটির মধ্যেই থাকার অধিকার তার ছিল। কিন্তু ব্যবস্থাটি ওই বাঁদরটার কখনোই মনমতো হয় নি। বার বার সে আমাদের ঘরগুলোর দরজা আঁচড়েছে, নিচে গর্ত খুঁড়েছে। একদিন সকালে দেখি তুলকালাম কাণ্ড — হলঘরের পাটাতনের অর্ধেকটাই উদোম, কাঠের প্রত্যেকটা টুকরো তোলা।

আমরা বাড়ি থাকলে আলিসাকে আমাদের ঘরে ডেকে আনা হত কিংবা না ডাকলে সে হুড়মুড় করে ছুটে আসত। দুঃখের ব্যাপার সে সব সময়ই ঘরের কোনের সবচেয়ে ঝক্কির ঘুপসিগুলি খুঁজে পেত, ওখানেই পাকাপোক্ত 'আস্তানা' গাড়ত।

আলিসা মাঝেমধ্যে আলমারির তলা থেকে জমকাল লেজটি ধরে তাকে টেনে বের করার দুর্লভ সুযোগ আমাকে দিত। সে হুমকি দিয়ে কাশত, দাঁত খিঁচাত, কট্‌মট্‌ করত, কিন্তু শেষপর্যন্ত বাগ মানত।

কিন্তু চুপিসারে সোফায় উঠে গদির স্প্রিংয়ের মধ্যে নিজের মতো করে একটি খোড়ল বানালে ওকে কী করা? গোড়ায় আমরা ভ্যাকুম ক্লিনার খুড়োর সাহায্য নিতাম। মুশকিল-আসান ভ্যাকুম ক্লিনারকে আমরা... সম্মান ক'রে এই নামটিই দিয়েছিলাম। যন্ত্রটির প্রথম ঘর্ঘর শোনামাত্র আলিসা সোফা থেকে লাফিয়ে নামত, চোখ বড় বড় করে তাকাত, তারপর ছুটে গিয়ে বাথরুমে তার গালিচার ওপর শুয়ে পড়ত। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ভ্যাকুম ক্লিনারে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। তার

ভয়ডর উবে গেল, প্রচণ্ড আক্রোশে যন্ত্রটার দিকে গর্‌গর্‌ করতে লাগল। এমন কি পরে কামড়ানোর চেষ্টাও করত।

তার আরেকটি চমৎকার শখ ছিল — টেলিফোনের তার চিবোন।...

কিন্তু আমাদের সবচেয়ে অসহ্য লাগত সারা ঘরে, এমন কি সিঁড়ি পর্যন্ত ছড়ান চিড়িয়াখানার বোটকা গন্ধ।

আমি বাসে বা পাতালরেলের কামরায় ঢুকলে লোকজন নাক কুঁচকাত — আমার সারা জামাকাপড়ে আলিসার গন্ধ। পাতালরেলে একদিন জনৈকা বিষমুখো হিংসুটে বুড়ির গলা কানে এল, 'হা ঈশ্বর, চোখে তো দিব্যি রংচং মাখা, আর ওদিকে গায়ে ছাগলের কী গন্ধ রে বাবা!'

এ থেকে মুক্তির কোন পথ ছিল না। সব ধরনের সুগন্ধিই তাতে হার মানত।

ওইসব দিনে হাতে নেকড়া নিয়ে কনুইতে ভর দিয়ে হামাগুড়িতে আমার বেশির ভাগ সময় কাটত। ঘসে ঘসে পরিষ্কার করা জায়গাগুলিতে সঙ্গে সঙ্গে মুখ-ধোয়ার একটি জিনিস ছড়াতাম। ওষুধের দোকান থেকে এগুলো একগাদা কেনায় দোকানী বেশ অবাকই হয়েছিল।

ভারত-ফেরতা আমার এক বন্ধু একটি অমূল্য উপহার দিয়েছিল — চন্দনের ধূপকাঠি। আমরা ওগুলোর নাম দিয়েছিলাম 'শিয়ালমারা'। তারপর থেকে অতিথি আসার আগে আগে আমি ঘরগুলোকে ধোঁয়ায় ভরে তুলতাম। একটা কিংবা দুটো সুগন্ধি ধূপকাঠি জ্বালাতাম। ক্ষয়ে ক্ষয়ে জ্বলে সেগুলো সমস্ত বাড়িতে এক মধুর, নেশা-ধরা ধোঁয়া ছড়াত,

সুদূর ভারতের কোন রহস্যময়, অজানা মন্দিরের গন্ধে ঘরগুলো ভরে উঠত। আর আলিসার ... কোন শিয়ালমারাই শতভাগ আলিসা-প্রুফ ছিল না।

সৌভাগ্য, গরমকাল আসার আগে আগে আলিসার গন্ধের সমস্যাটির কিছুকালের জন্য সুরাহা হল। মস্কোর শহরতলীতে আমরা একটা বাগানবাড়ি ভাড়া নিলাম। চারিদিকে ঘের দিয়ে একটা কুকুরের খোঁয়াড় তৈরি করলাম — আলিসার জন্য বিলাসী আবাস।

নতুন বাড়িতে আসার পরদিন অবাক হয়ে দেখলাম ঘেরা জায়গায় আলিসা আর শান্ত মজার এক খেলায় মেতেছে। আমুদে কুকুরছানার মতো ধস্তাধস্তি করছিল ওরা। অথচ শেয়ালের প্রতি কুকুরের ঘৃণার তো শেষ নেই! এই কিনা শেয়ালের প্রতি কুকুরের তথাকথিত মজ্জাগত ঘৃণার প্রমাণ !

অবশ্যই বলব যে শান্তর মতো এমন ভালো স্বভাবের মিশুকে প্রাণী আমি জীবনে দেখি নি। সে সকলেরই বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করত, এমন কি মাশা-ঠাকরুনের এই ভাড়াবাড়ির এলাকায় রাতের অতিথি বুনো সজারুদের সঙ্গেও। তবে সবসময় তার এইসব চেষ্টার পরিণতি একরকমই হত। রক্তমাখা জখমী নাক আর বিনষ্ট আশায় তা শেষ হলেও এর পরের বারের কাঁটাওয়ালা খুঁতখুঁতে পিন্ডটি যে তার অমল ধবল মনের খোঁজ পাবে সে-বিশ্বাস হারাত না।

কিন্তু শান্ত ওই খোঁয়াড়ে ঢুকল কী ভাবে? দু' মিটার উঁচু বেড়া লাফিয়ে?... ঠিক আছে, দেখা যাক ফেরার পথে কী করে?

কিন্তু, মনে হল খুব সহজেই কাজটা সে সারল। থাবা দিয়ে তারের জাল আঁকড়ে ধরে বিড়ালের মতো দিব্যি বেড়া ডিঙাল। দৃশ্যটি নয়নভুলানো না হলেও 'বেড়ার উপর কুকুর' এই প্রবচনটি চোখে দেখার সৌভাগ্য হল।

শান্ত এখন দিনে বা রাতে যেকোন সময় তার বন্ধুর কাছে হাজির হতে পারত। দেখাশোনার ধরনে সাধারণত কোন রকমফের ঘটত না। শান্তকে দেখামাত্র উতলা আলিসা খোঁয়াড়ের বেড়ার ভেতরে ছটফট শুরু করত। এটা চলত যতক্ষণ না শান্ত আলিসার রাজ্যে লাফিয়ে পড়ে ওর উদ্যত লেজটা কামড়ে ধরে ফেলার দুরাশায় পিছু পিছু ছুটত। শিকারী ও শিকারের উত্তেজনা চরমে পৌঁছুত। আলিসা কখনো হঠাৎ এমনভাবে বাঁক নিত যে শান্ত পুরোবেগে চলতে চলতে টাল সামলাতে না পেরে খোঁয়াড়ের বেড়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

লুটোপুটির আওয়াজ শুনে কখনো পুসি ছুটে আসত। খোঁয়াড়ের একটি খুঁটির ওপর উঠে টঙের সান্ত্রীর মতো গাঁট হয়ে বসে থাকত, চওড়া হলুদ চোখ মেলে 'লড়ুয়েদের' দেখত। অবশ্যই সে ছিল আলিসার পক্ষে। নৃশংস কুকুরের কামড়ে বেচারী শেয়াল কখন যে অক্কা পায় এই ভয়ে সে কুঁকড়ে থাকত। সেইসব মুহূর্তে সে পিঠটা যথাসম্ভব উঁচু করে, বাঁকিয়ে, লোম খাড়া করে প্রাণপণে ফোঁসফোঁস করত। যেন এখনই শান্তর ওপর লাফিয়ে পড়বে। অনেক বারই শেষ মুহূর্তে তাকে টঙ থেকে হিঁচড়ে নামিয়েছি।

আলিসা আর শান্ত একই সঙ্গে গামলায় খাবার খেত। বাড়ির

কর্ত্রীঠাকরুন হিসাবে আলিসা সব সময়ই প্রথম শুরু করত। শান্ত সাবধানে পাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁট চাটত, বন্ধুর ভোজ শেষ না হওয়া অবধি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করত। কিন্তু বন্ধুটি ছিল বেজায় হিংসুটে আর সবটুকু খাবার গেলা সাধ্যে কুলোবে না ভেবে বেপরোয়া হয়ে উঠত। মাংসের বড় বড় টুকরোগুলো সে না চিবিয়ে তড়িঘড়ি গোগ্রাসে গিলত। আমার সব সময়ই ভয় হত, গলায় মাংস আটকাবে! শেষ পর্যন্ত দু'জনের জন্য বরাদ্দ মাংস ঠাসার মতো পেটে আর জায়গা নেই বুঝে বড় এক টুকরো মাংস কামড়ে ধরে এদিক ওদিক ঢুঁড়ে বেড়াত। সে যেন বলতে চাইত বন্ধুত্ব আর যেখানেই হোক এখানে খাটে না।

বাতিকগ্রস্তের মতো আলিসা শেষপর্যন্ত ওই অমূল্য ধনটি মাটিতে পুঁতে ফেলত আর তক্ষুনি আবার অস্থির হয়ে সেটা তুলে ফেলে মুখে নিয়ে খোঁয়াড়ের চারিদিকে ঘুরে বেড়াত। শান্ত নিশ্চিন্তে তার এই উদ্ভট ছুটোছুটি দেখত এবং শেষে একসময় তেমনি নিশ্চিন্তে লুকানো ভাঁড়ারটি হাত দিয়ে, নাক দিয়ে খুঁড়ে ওই খাবারটুকু সাবাড় করত।

শিয়াল আর কুকুর হরিহর আত্মা হয়ে উঠেছিল। তাদের এই বন্ধুত্ব দেখে আমরা সত্যি খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু একদিন কুকুরছানার বিলাপী কান্না কানে এল। কে নালিশ করছে? কাকে কে ব্যথা দিল? দেখলাম আলিসা কাঁদছে। খেলা জমে উঠতেই শান্ত তাকে ফেলে গেছে। নিদয়া বন্ধুর জন্য সে ছোট্ট বানর-ছানার মতো তারের জাল বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আধ মিটারের বেশি ওপরে সে উঠতে পারছিল না, পড়ে যাচ্ছিল, আবার উঠছিল, পড়ছিল...
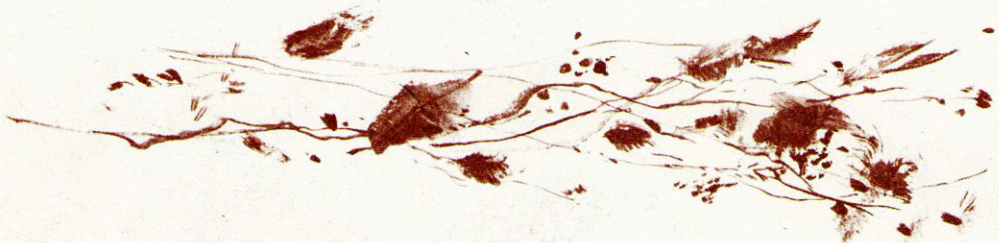
তারপর সেই করুণ বিলাপ প্রায়ই শুনতাম। আলিসার খোঁয়াড় ডিঙান মক্‌শ করে শান্ত আমাদের বাড়ির বেড়া ডিঙোতে শুরু করল। সে আর বাড়িতে তিষ্টাত না। ছুটত গাঁয়ের এক দঙ্গল কুকুরের পিছু পিছু। প্রায়ই বহুকণ্ঠের প্রচণ্ড চিৎকার শোনা যেত। বুঝতাম কুকুরের আরেকটি লড়াই শুরু হয়েছে।

মাঝেমধ্যে একনাগাড়ে তিন দিনের জন্য শান্ত নিখোঁজ থাকত আর ফিরত সারা গায়ে কামড়ের দাগ নিয়ে, হাড্ডিসার করুণ চেহারা নিয়ে। গলার বকলসটা সবসময়ই খুইয়ে আসত সে।

বাড়ি ফিরে শান্ত বেড়া থেকে তার ঘর পর্যন্ত পথটুকু হামাগুড়ি দিতে দিতে আসত। কয়েকদিন কোথাও বেরত না। বসে বসে সারাদিন ঘা চাটত, যেন মর্মাহত অন্তরে বাহিরে। তারপর আবার বেপাত্তা।

আলিসা মনমরা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আগেকার ফুর্তিবাজ স্বভাবটি আর রইল না।

এক সফরশেষে শান্ত একদিন আলিসার খোঁয়াড়ের দিকে এগোল। যেমনটি ভেবেছিলাম তা ঘটল না। আনন্দে পাগল হওয়ার বদলে আক্ষরিক অর্থেই আলিসা মুখ ফিরিয়ে রইল। বৃথাই শান্ত ছুটোছুটির সেই আনন্দের খেলায় মাততে চাইল। কিন্তু আলিসা ওর দিকে উদাস চোখে তাকাল, ফোঁসফোঁসিয়ে উঠল, শেষে হেলেদুলে ঘরের দিকে ছুটে গেল।

খুব সকাল। আমার হাতে খাবারের গামলা।

আমাকে দেখামাত্র সারা রাতের উপোসী আলিসা অস্থিরভাবে বেড়ার ভেতরে ছটফট শুরু করে। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছল কুকুরছানার মতো আমাকে ঘিরে সে লাফাতে থাকে, ধৈর্য হারিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে আমার স্কার্ট টানতে শুরু করে।

আমি তারপর খোঁয়াড় পরিষ্কার করি আর আলিসা খোশ মেজাজে আমাকে বিরক্ত করতে থাকে: পায়ে পায়ে ঘোরে, নোংরা খড় জড় করে তোলার জন্য আমি যখন বিদা তুলে নিই তখন সেটার ওপর লাফিয়ে পড়ে, যেন কিছু ধরার জন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজছে পায়ের ফাঁকে, ইঁদুর শিকারের সময় শেয়ালরা যেমনটি করে।

দিন ভালো থাকলে গোটানো যায় এমন একটি হালকা টেবিল ও চেয়ার নিয়ে আমি খোঁয়াড়ে ঢুকি। কাজে বসি। টেবিল আর চেয়ারের পায়াগুলোতে আলিসার দাঁতের দাগ।

আলিসার কাছে থাকার জন্য, তার আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য আমার প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি মিনিট আমি কাজে লাগাতে চাই।

খোঁয়াড়ে বসে আমি ভাবতে ভালোবাসি। অদ্ভুত এই তারের বেড়া যেন আমাকে নিত্যদিনের ঝামেলা থেকে, দুশ্চিন্তা থেকে আড়াল করে রাখে।

আলিসা মনোযোগ দাবি করে। সে টেবিলের পায়ায়, কখনো-বা আমার পায়ে দাঁত বসাতে থাকে। আমার মন একটুও বিক্ষিপ্ত হয় না। আমি আনমনে তার সঙ্গে খেলি, আপন চিন্তায় ডুবে থাকি। একটি চিন্তা আমাকে নিরন্তর আনন্দে আবিষ্ট রাখে: পৃথিবীতে অন্তত

একটি প্রাণী আছে যাকে আমি সকল দুর্দৈব থেকে আড়ালে রাখতে পারি।

(তখন আমি তাই বিশ্বাস করতাম। নিয়ম ও দুর্দৈবের অজেয় মিশ্রণ বা ভবিতব্য থেকে যেন কাউকে বাঁচান যায়।)

মাঝেমধ্যে আমি আলিসাকে বনে বেড়াতে নিয়ে যেতাম। শিশুর মতো সে আমার কোলে থাকত। শেকলে বেঁধে কখনই তাকে হাঁটতে শেখান হয় নি। এই বনে বেড়ান আলিসা দারুণ ভালোবাসত। সে ছিল বানরের মতো কৌতূহলী আর বন তো মজার জিনিসে বোঝাই।

এমনি একদিন একটি ঘটনার ফলে আলিসার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে যায়।

যথারীতি বেড়াতে গেছি। গ্রীষ্মশেষের নির্মেঘ, ঈষৎ বিষণ্ণ এক দুপুর। ছুটির দিনের হুল্লোড়ে লোকেদের ভিড় আর নেই। ট্রানজিস্টারের পরিত্রাহি আওয়াজ থেকে বন রেহাই পেয়েছে। তীরের মতো সোজা করে কাটা জঙ্গলের একটি ফালি দিয়ে আমরা চলেছি। বার্চের গুঁড়িগুলো উজ্জ্বল, ঝক্‌ঝকে আকাশ, নিথর নৈঃশব্দ্য। হঠাৎ নারীকণ্ঠের চিৎকার কানে এল। আশপাশে চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম বাছুরের মতো বিরাট এক সাদা লোমশ কুকুর ওই পথ দিয়ে সোজা আমাদের দিকে নিঃশব্দে ত্বরিতে ছুটে আসছে। মুহূর্তে মনে পড়ল এটা দক্ষিণ রাশিয়ার ভেড়ার পাহারাদার জাতের হিংস্র পাইরেট কুকুর।

পাইরেটের পাহারায় রাখা বাগান থেকে আপেল-লোভী গাঁয়ের

ছেলেমেয়েরাই শুধু দূরে থাকে না, পরের ফল-ফলাদি সম্পর্কে নিরাসক্ত বয়স্করাও ওই বাগানের বেড়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সাদা লোমের ঝোপে চোখ-ঢাকা বিশাল ভয়ংকর জানোয়ারটিকে হলুদ কষের দাঁত খিঁচিয়ে ভেতরে ছটফট করতে দেখে তার দিকে নজর রেখে পা টেনে টেনে চলেন।

আর এখন সেই ভয়ংকর জন্তুটিই আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। অনেকটা পিছিয়ে পড়া, উঁচু হিলের জুতো-পায়ে এক মোটাসোটা মহিলা ছুটছেন, চেঁচাচ্ছেন, শেকলটা ঘুরাচ্ছেন। কুকুরটি তাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে এগোচ্ছে এক অটুট অশুভ নৈঃশব্দ্যে।

আমাদের মধ্যকার ফারাক এক ভয়ংকর ভবিতব্য নিয়ে ক্রমেই কমে আসছিল। দৌড়ে পালান বোকামিই হবে। তাতে বিপদ আরও বেশি। ঠাঁই দাঁড়িয়ে থেকে মালিক তার শেকল নিয়ে না পৌঁছন পর্যন্ত কুকুরটিকে কিছু বলে-কয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ভয় পেয়েছি তা না-দেখানোই মূলকথা।

কিন্তু আলিসার পক্ষে পালানোর তখনও যথেষ্ট সময় ছিল। পাইরেটের কাছে আলিসাকে উৎসর্গ করার কোন বাসনা আমার ছিল না। এখনই তাকে এই মুহূর্তে ছেড়ে দিতে হবে, এমন কি আর কোনদিন খোঁজ না পেলেও।

আলিসাকে মাটিতে ছেড়ে দিতেই সে ঝোপের আড়ালে উধাও হল।

ওর পালানোটা হয় কুকুরটির চোখে পড়ে নি, কিংবা সে আমাকেই যুতসই শিকার ঠাওরেছে। সে তার হামলার লক্ষ্য পরিবর্তন করল না।
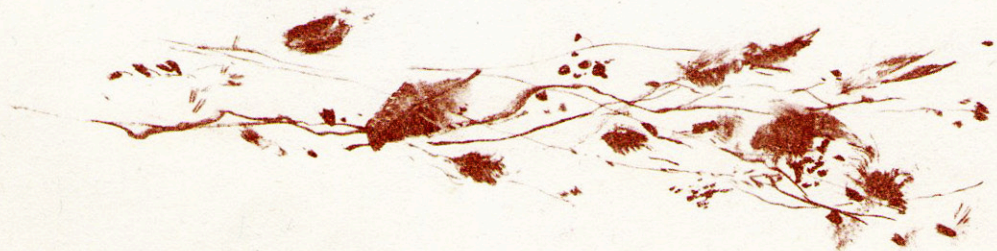
আমার দিকেই এগিয়ে এল, নিঃশব্দে, না চেঁচিয়ে। আর সেটাই ছিল ওর আক্রমণের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক।

মোটাসোটা পুরনো এক বার্চ গাছে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের দূরত্ব এখন দু'মিটারের বেশি নয়। 'পাইরেট, ডগি,' ফিসফিসিয়ে নিদারুণ বিরক্তিকর মধুর, মিনতিভরা কণ্ঠে বললাম, 'কামড়াস নে বাপু, দোহাই তোর।'

কুকুরটি ক্ষণিক দাঁড়াল। তার এই বিব্রত অবস্থার সুযোগে আরেকটু আস্থার সুরে বলতে লাগলাম, 'কী সুন্দর তুই দেখতে, চালাক-চতুর, মায়াভরা মুখ...।'

সেই মুহূর্তে দেখলাম পাইরেট লাফ দেয়ার জন্য টানটান হচ্ছে, তাক করছে সোজা আমার গলাটি। প্রথম বারের লাফটি তেমন উঁচু ছিল না। দ্বিতীয়টা কীভাবে এড়ালাম জানি না।

তৃতীয় হামলার জন্য প্রাণ হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে চোখের কোণ দিয়ে পাইরেটের মালিক হেলেদুলে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে কদ্দূর এগোল তা দেখছিলাম। ভয় তাকে কিছুটা বাড়তি শক্তি যোগালেও সম্ভবত তার পক্ষে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তার পক্ষে কি এই হিংস্র কুকুর সামলান সম্ভব?

শেষের নিশ্চিত লাফের জন্য গুটিসুটি প্রস্তুত পাইরেট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত — দেখলাম আমার খুদে দুরন্ত শেয়ালী ডালকুত্তার মত পাইরেটের পেছনের পায়ে দাঁত বসিয়েছে।

পাইরেট তড়িৎগতিতে ঘুরে তাকিয়ে ঝাঁপ দিল। কিন্তু কামড় বসাল শুধু হাওয়ায়। আলিসা ফুলো লেজ তুলে ততক্ষণে উধাও। এই রকম দৌড়ের সময় সে দ্বিগুণ ছোট হয়ে যায় বলে তাকে ধরে কার সাধ্য! পাইরেট আমাকে বেমালুম ভুলে গিয়ে আলিসার পিছু ছুটল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি খুব সহজ একটা পথ ধরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলাম।

আলিসা যে সহজেই পাইরেটের খাবলা এড়িয়ে পালাতে পারবে তাতে কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে কি আর বাড়ি ফিরবে?

খোঁয়াড়ের কাছে ছুটে গিয়ে দেখলাম আলিসা তার ঘরের ছাদে চুপচাপ শুয়ে আছে। কেবল তার পাশগুলি অস্বাভাবিক দ্রুত ওঠানামা করছে। তাছাড়া তার সব কিছু — আলসে এলিয়ে পড়া ভঙ্গি, আধবোঁজা চোখ — যেন বলছিল, 'কী ভাবছ? যা করেছি যেকোন গরবী শেয়ালই তা করত। এশিয়া আর দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের মরু আর মরুপ্রায় এলাকায় আমরা কখনই বিপদে বন্ধুদের ছেড়ে যাই না।'

অক্টোবরের বাদলা দিন ঘনিয়ে এল। মস্কোর শহরতলীতে আমরা সবাই ভাড়া ঘরের মধ্যে বসে আছি, ভাবছি আলিসাকে নিয়ে কী করা? তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম: ওকে আর শহরের ফ্ল্যাটে রাখা যাবে না। শেষপর্যন্ত যেন জীবনই সমস্যাটি সমাধান করল।

এই মাসেরই শেষ নাগাদ জরুরি কাজের তাগিদে আমাকে অন্যত্র যেতে হল। অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়িওয়ালী মাশা ঠাকরুনের কাছেই আমাদের পোষ্যগুলি রেখে আসি। ওই বুড়ি আলিসাকে একদমই
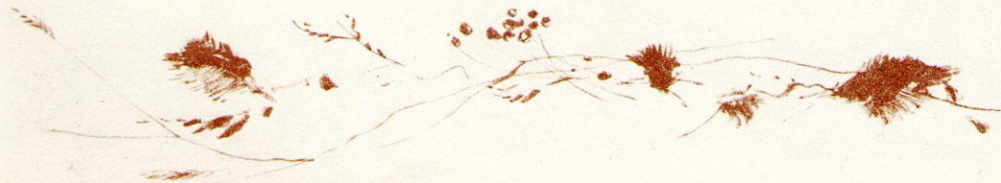
দেখতে পারত না। কেন যে লোকে এরকম 'অকেজো' জন্তু-জানোয়ার পোষে বুড়ি তা বুঝত না।

তিন সপ্তাহ পরে ফিরে আলিসার ঘরটি খালি দেখে মাশা ঠাকরুনের কাছে ছুটে গেলাম। তিনি আহ্লাদী স্বগতোক্তিতে আমাকে স্বাগত জানালেন, 'তোমরা যাওয়ার দু'দিন পরই আলিসা তো পালিয়ে গেল। যেভাবে বলেছিলে ঠিক তেমনি সেদিন সকালে খাবারের গামলা নিয়ে যেতে যেতে ভাবি যে পাজিটা লাফিয়ে বেরুবে, কিন্তু সে তো বেরুল না। দেখলাম দরজাটা হাঁমুখ। আমি আগের রাতে হয়ত ছিটকিনি আটকাতে ভুলে গিয়েছিলাম। আর জানই তো শেয়াল পাজির পা-ঝাড়া, আন্দাজ করে...। তা এখন আর চেঁচিয়ে লাভ কী? ভালোই তো হল। তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেল। কী ঝামেলাটাই না পোহাতে বাছা।'

আলিসা পালিয়ে যাওয়ার পর বিশ দিনেরও বেশি কেটে গেছে। জানতাম, যদি সঙ্গে সঙ্গেই মারা পড়ে না থাকে তাহলে অন্তত সে এক-দু'বার এখানটা ঘুরে যেত। কিন্তু ঠাকরুন ছাড়া বাড়িতে আর জনপ্রাণী ছিল না।

খুব সম্ভব মুক্তির প্রথম দিনটিই ছিল আলিসার জীবনের শেষ দিন। কুকুর বা শিকারী কেউই তাকে রেহাই দেবে না। হঠাৎ এসে পড়া জগৎটিকে হয়ত সে খুব বেশি বিশ্বাস করে বসেছিল। সেখানে খাবার যোগাড় করা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা থাকার কথা নয়...

তেমন কিছু আশা না করেই আমি তার ঘরের ছাদে একটুকরো মাংস রাখি। সকালে দেখলাম কেউ ছোঁয় নি।

কিন্তু পরদিন ওটা আর ছিল না। কিন্তু শেয়ালের ঘরের পাশে কাদার ওপর বিড়ালের পায়ের স্পষ্ট ছাপ দেখলাম।

আমরা শহরে ফিরলাম।

তবুও আলিসার ঘরের ওপর কিছুটা খাবার রাখতে আমি মাশা ঠাকরুনকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু বুড়ি আমার কথা রাখলেও জানতাম শুধু তা যাবে গাঁয়ে বেড়াতে-আসা লোকজনের ফেলে যাওয়া ছন্নছাড়া বিড়ালগুলির পেটে।

বাইরে যাওয়ার একটি কাজের প্রথম সুযোগটিই আমি লুফে নেই। ফিরে এসে সারা শীতকালটা শহরেই কাটাই। তারপর কেবল মার্চ মাসের শেষের দিকেই মাশা ঠাকরুনকে দেখতে যাই।

উজ্জ্বল বসন্তদিন। ততদিনে দুঃখস্মৃতিগুলির ধার অনেকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত কালে কালে মন থেকে সব কিছুই একসময় মুছে যায়... তবে খোঁয়াড়টি শুধু সাবধানে এড়িয়ে যেতাম।

সেই রাতে আলিসাকে স্বপ্নে দেখলাম। তার গলার আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেই ঝিঁঝি গুনগুন — আলিসার সানন্দ বিস্ময় ব্যক্ত করার ধাঁচ।

আলো জ্বালালাম। কিছুক্ষণ পড়াশুনার পর আবার এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে কাঁপুনি-ধরা বুকে দেখলাম নরম বরফের ওপর বাড়ির দিকে দৌড়ে আসা আমার লাগোয়া জানালা পর্যন্ত পায়ের দাগকাটা সরুপথ। ছোট্ট পাঁচটি আঙুলের ছাপ, অবিকল আলিসার থাবার মতো।
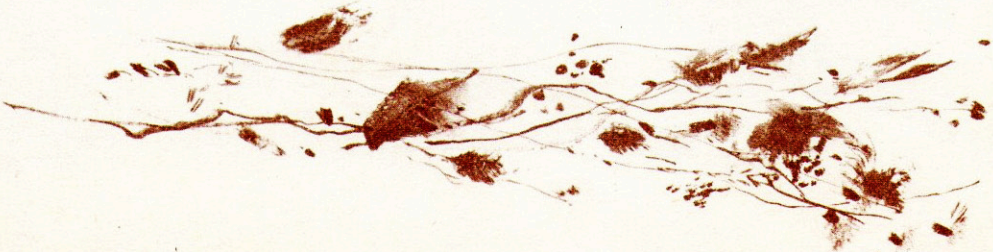
ছোট্ট শেয়ালটি কি বেঁচে আছে? কোন অস্পষ্ট স্মৃতি কি বেচারীকে মাশা ঠাকরুনের বাড়ির কাছে টেনে এনেছিল যখন আমি ওখানেই রাত কাটাচ্ছি?

কিংবা হয়ত অন্য কোন প্রাণীর পায়ের দাগ। বন তো ঘরের পাশেই। সেটাই বরং ভালো। অসীম নিঃসঙ্গতায় নিষ্পিষ্ট একটি প্রাণী আমার আশেপাশেই ঘুরছে, যাকে আমি ছাড়া আর কেউ চায় না, অথচ আমার কাছে সে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে, সেজন্য আমিই দায়ী, কেননা আমিই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলাম, কিন্তু তাকে রাখতে পারি নি — এমন ভাবনা বড়ই অসহ্য।

আলিসা... কোথা থেকে এসেছিল কেউ জানে না। কোথায় গেছে তাও কারও জানা নেই, আমিও আর — আর কোনদিন জানতে পারব না মার্চের সেই রাতে ভেজা বরফের ওপর কে ওই পায়ের দাগগুলো রেখে গিয়েছিল।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন

১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার

মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow 119859, Soviet Union